দেবেশ রায় : কোন ভাঙনের পথে এলে

তপোধীর ভট্টাচার্য

সতর্ক পড়ুয়ারা জানেন, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত এই গানটি খুব প্রিয় ছিল তাঁর। তাই তো সাহিত্য অকাদেমির হয়ে *রক্তমণির হারে* নামে দেশভাগ স্বাধীনতার গল্প সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে (১৯৯৯) গানটির কথা দেবেশ রায়-এর মনে পড়েছিল। 'ভূমিকা' (পুরাণ থেকে পুরাণ) উপস্থাপনার আগে, এমনকী, সূচি নির্দেশ করারও আগে, ১৯৩৯ সালের ১২ জুলাই রচিত গানটিকে শিরোভূষণ করেছিলেন তিনি। আর, খুবই সংকেতগূঢ় ভাবে, ৩০ মে ২০২০, সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ন-টা অবধি, খুবই আন্তরিক অনলাইন স্মরণ-অনুষ্ঠানে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতায় গাওয়া হল সেই একই গান। আসলে আমরা প্রত্যেকেই তাঁকে গেঁথে নিয়েছি রক্তমণির হারে। যত গোপন নিভৃত বেদনা মথিত করবে আমাদের, ততই সৃষ্টি ও মননের যুগলবন্দিতে দীপ্যমান কথাকার দেবেশ রায় বক্ষে দুলবেন। তাঁর অসামান্য অবদান ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় সুরহারা মূর্ছন তাতে ফিরে ফিরে আসবে। কোভিড মারীবীজ বিশ্বব্যাপ্ত ত্রাস তৈরি করাতে আমরা অনেকেই গত ১৫ মে বাধ্যতামূলক শারীরিক দূরত্ব রচনা করেছিলাম। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬ থেকে ১৪ মে ২০২০ পর্যন্ত ব্যাপ্ত যাত্রাপথে অজস্র সৃষ্টির কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন রেখে গেছেন তিনি। প্রচলিত নিরিখে তাঁকে বহুপ্রজ লেখকই ভাবতে হয়। কিন্তু যেখানে তাঁর আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য তা হল, নিয়ত আত্মবিনির্মাণে উৎসুক তিনি। সেই যে 'উপন্যাস' অভিধার অচলায়তনকে প্রত্যাহ্বান জানালেন, এরপর থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত রইল 'আখ্যান'-এর নতুন নতুন সংরূপ নির্মাণের, 'প্রতিবেদন' নিয়ে অফুরান নিরীক্ষাধর্মী প্রয়োগের।

দেবেশ রায় বড়ো মাপের গদ্য-ভাবুক। তিনি যখনই কোনো তত্ত্বাশ্রয়ী কথা লিখেছেন তাতে বৌদ্ধিকতার দীপ্তি ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা মণিকাঞ্চন সংযোগের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। *রক্তমণির হারে*-র ভূমিকায় যেভাবে তিনি অতি প্রচলিত 'উপন্যাস'-এর বদলে 'আখ্যান' ব্যবহার করার সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তাতেই তাঁর অধ্যয়ন ও মননের বিপুল ব্যাপ্তি ও বিরল গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। তবে যে-বিষয়টি এখানে এবং অন্যত্র খুব নিবিষ্টভাবে লক্ষ করতেই হয়, তা হল, তাঁর গদ্যগুলিতে সারল্যেরও ব্যাসকূট রয়েছে

যাদের যথার্থ সমাধান না করলে তাৎপর্য পুরোপুরি স্পষ্ট হয় না। যেমন, ইংরেজি উপন্যাসের একটি ধরনকে মান্য আকল্প হিসেবে যেহেতু গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র— বাংলা মঙ্গলকাব্য-পাঁচালি-কথকতার নিজস্ব আখ্যানভঙ্গি হারিয়ে গেল। (দ্রষ্টব্য : *রক্তমণির হারে* : ১৯৯৯ : পৃষ্ঠা ১৯) অর্থাৎ আখ্যান-পরম্পরার সঙ্গে বাঙালি লিখিয়ের এবং শিক্ষিত পাঠকেরও বিচ্ছেদ রচিত হল। এই বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী হয়ে গেল ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আত্মগর্বী হস্তক্ষেপে, তাও আমরা লক্ষ করি। ওই যে বাঙালির আলো-হাওয়া-রোদে সম্পৃক্ত 'নিজস্ব আখ্যানভঙ্গি', তাকেই কি সময়োচিত পুনর্ভাষ্য-সহ *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, তিস্তাপুরাণ, সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* প্রভৃতি আখ্যানে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করলেন দেবেশ রায়? কিন্তু আরও কথা আছে। আলাল, হুতোম, বিভিন্ন প্রহসন, নকশায় প্রস্তাবিত যে-সমকালীন বাস্তবতার 'মহৎ শিল্পরূপে অন্বিত হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট' (তদেব) হওয়ার আশঙ্কা জেগেছিল তাঁর মনে, তার যথেষ্ট নিরসন কি কথাকার দেবেশ স্বয়ং করে যাননি?

এই মুহূর্তে অবশ্য এটা বিবেচনা করছি না, তাঁর নিজস্ব আখ্যানে ও প্রতিবেদনে তিনি কতটা আপন আখ্যান-ভাবনার প্রয়োগ উপযোগিতা পরখ করেছেন। আপাতত তা স্থগিত থাকুক, হ্যাঁ, জাক দেরিদার বহু আলোচিত 'deferment'-এর সূত্রে; তত্ত্বগুরুর অন্যপ্রধান তত্ত্ববীজের মতো এতেও রয়েছে বহুমাত্রিক তাৎপর্য ও জটিলতা। তাই তাৎপর্যের খোঁজে স্বর থেকে স্বরান্তরে পৌঁছোনোর তাগিদে দেরিদার সুগভীর বার্তাবহ ইশারাগুলি অনুসরণ করতে পারি। *Speech and Phenomena* (Northwestern University Press : 1973) বইতে তাৎপর্য-বিস্তারের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে ভাবনা সঞ্চরণে পার্থক্য-প্রতীতির গুরুত্ব ব্যক্ত হয়েছে। বোধের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যাত্রায় প্রাগুক্ত 'স্থগিতীকরণ' যে-অনুপাতে সক্রিয় হয়, তাৎপর্যবাহী বয়ান তত বেশি সার্থক হয়ে ওঠে। সময় ও পরিসরের যাত্রায় পার্থক্য প্রতীতির সামর্থ্যেই যথাপ্রাপ্ত বর্তমান বুঝিয়ে দেয়; 'Difference is what makes presence possible while at the same time making it differ from itselft.' (Nicholas Royle : Jacqnes Derrida : Routledge : London : 2007 : 71)। এই যে নিজের সঙ্গে নিজেরই ব্যবধান রচনার সঙ্গে সঙ্গে আস্তিত্বিক উপস্থিতিতে চেতনাগ্রাহ্য করে তোলার প্রক্রিয়া তারই সামর্থ্যে সৃজনশীল শিল্পসংবিদ লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে। বহুপাঠে সমৃদ্ধ দেবেশ রায় যেন ফ্লবেয়ার কথিত সেই বহুচর্চিত সমস্যার নিজস্ব সমাধান খুঁজে নিয়েছিলেন : 'We have too many things and not enough forms.' তাঁর আখ্যান-ভাবনায় যে নতুন সংহিতার খোঁজ প্রতিফলিত হয়েছে, তা সমস্ত অভ্যাসের রুদ্ধতা থেকে সম্ভাবনার মুক্ত পরিসরে চেতনাকে সম্প্রসারিত করার জন্যে। *The Ear of the Other* (New York : 1985) বইতে দেরিদা মহামনীষী প্লেটো সম্পর্কে যে-দ্যোতনাগর্ভ মন্তব্য করেছিলেন— 'to be read and read constantly, plato's signature is not yet finished'

(পৃষ্ঠা ৮৭)— তা দেরিদা সম্পর্কেও একইভাবে প্রযোজ্য। এবং দেবেশ রায় সম্পর্কেও। কেননা সৃষ্টি ও মননের দ্বিবাচনিকতায় দেরিদা ও দেবেশ নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিয়ত আত্মবিনির্মাণ প্রবণ। তাই যেমন প্লেটো কিংবা অন্যসব মান্য তত্ত্বগুরুদের এবং সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা করণীয়— নিরবচ্ছিন্ন পুনঃপাঠ ও পুনঃজিজ্ঞাসা— তা দেবেশ রায়ের পক্ষেও সমান প্রযোজ্য। তাই নির্দ্বিধায় লেখা যায়, তাঁর (এবং জাক দেরিদারও) 'Signature is not yet finished'— এমনকী, তাঁদের কায়িক অবসানের পরেও।

সুতরাং দেবেশের আখ্যান-ভাবনার তাৎপর্যও তাঁর লিখন প্রক্রিয়ার পর্বে-পর্বান্তরে মুলতুবি হয়েছে যাতে ক্রমিক পুনর্বিবেচনা তাতে নতুন নতুন দিশা যুক্ত হতে পারে। বর্তমানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন যাবতীয় সম্ভাবনার অন্তর্বর্তী পার্থক্য-প্রতীতিকে ক্রমাগত আবিষ্কার করতে করতে আখ্যান-ভাবুক জীবন ও জগতের সম্ভাব্যতা আর অসম্ভাব্যতা খনন করেন। সেইসূত্রে আখ্যানের শিল্পস্বভাবও ক্রমশ শানিত হয়ে ওঠে এবং অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের দিগন্ত-বিস্তার ঘটতে থাকে *Speech and Phenomena* বইয়ের অন্তিম পরিচ্ছেদে জাক দেরিদা স্পষ্ট করেছেন কীভাবে : 'Difference brings together the two notions of differing and deferring.' এবং এর নিগূঢ় বহুমাত্রিক তাৎপর্য পড়ুয়াদের কেমন করে অনুধাবন করতে হবে :

> Differance is to be conceived prior to the separation between deferring as delay and differing as the active work of difference. Of course this is inconceivable if one begins on the basis of consciousness that is, presence or on the basis of its simple contrary absence or non consciousness.
>
> (পৃষ্ঠা ৮৮)

এই ভাবনাসূত্রের সৃজনশীল ভাষ্যই কি করে গেছেন দেবেশ, আজীবন? সেই আখ্যানই তো চাইছিলেন তিনি যা অমোঘ অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত। সার্থক কথাকার এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে লিখনবিশ্ব নির্মাণ করেন যে, তিনি যেভাবে জীবন ও জগতের প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠা করছেন যা অন্য কোথাও নেই। যেমন, দেবেশ রায় যদি *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* না লিখতেন, পাঠক কি বাঘারু নামক everyman-এর সন্ধান পেতেন! বস্তুত অনন্য এই কথাকার তো দার্শনিক মের্লো-পঁতির মতো বলতে পারতেন : 'My own works take me by surprise and teach me what I think.' (Paris : 1952 : 97) কিংবা লিখতে পারতেন :

> The writer's thought does not control his language from without the writer is himself a kind of new idiom constructing itself.
>
> (North Western University Press : 1964 : pp. 8-9)

হ্যাঁ, এইসব দার্শনিক চিন্তাসূত্রের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণিত হয়েছে *তিস্তাপুরাণ, সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, দাঙ্গার প্রতিবেদন, একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন*-এর মতো অসামান্য সব বয়ানে। দেবেশ স্বয়ংই যেন হয়ে উঠেছেন মের্লো-পঁতি কথিত 'a kind of new idiom, constructing itself'। এবং অতিমারীর সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত বিশ্বে আর ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্রূর ও নিশ্ছিদ্র অন্ধতায় তাড়িত 'হিন্দুস্থান'-এ নব্য অঘোর বাস্তবতায়ও তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন আখ্যানের নতুন বাগ্‌বিধি সন্ধান ও নিরন্তর আত্মনির্মিতির প্রেরণা। এ বছর (২০২০) উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি কলকাতায় নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশভাগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে তাঁর অনবদ্য মৌখিক বয়ান শুনেছি। অনবদ্য শুধুমাত্র তাঁর বাচনশৈলীর জন্যে নয়; সেদিন এক বিরল দেবেশ রায়কে পেয়েছিলাম যিনি, জাতিসত্তা-বিস্মৃত প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য-পণ্য যোগানদারদের মতো, বাঙালি জাতির আদিপাপকে ভুলে যাননি। বরং দুর্বহ বেদনার মন্থনে প্রকাশ্যেই বিগলিত-করুণা হয়ে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদেরও দ্রবীভূত করে তোলেন। তখন তো জানা ছিল না, অতিমারীর আরোপিত বন্দিশালায় রুদ্ধ হয়ে যাব; তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না কখনো। থাকবে শুধু আভূমিতল তাঁরই স্মৃতি-গ্রথিত নীলাঞ্জন ছায়া। থাকবে খড়্গপুরের আলোচনাচক্রে আখ্যান-বিষয়ে তাঁর অসামান্য বক্তৃতার স্মৃতি; থাকবে বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাগৃহে *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* সম্পর্কে চিন্তামন্ত্র তাঁর বাঙ্ময় নীরবতার উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি। সেইসঙ্গে মনে আসে আরও কিছু আলোকিতক্ষণ যখন তিনি প্রমাণ করেছেন, বক্তৃতা মূলত বাচনের শিল্প— প্রত্যক্ষ সংযোগের আরেক নান্দনিক সংহিতা। তবু সব গান যেমন সমে ফিরে আসে; তেমনই ফিরে যেতে হয় এই প্রস্তাবনায় : আখ্যানের কথকতা মূলত সত্তাতাত্ত্বিক নান্দনিক ও সামাজিক দর্শনেরই যৌথ অভিব্যক্তি, যাকে নিরন্তর পুনরাবিষ্কার করে যেতে হয়। বিশেষত যখন দানবায়িত মিডিয়া আমাদের বাস্তব, কল্পনা, চেতনা, অবচেতনা, বিবেক, সৌন্দর্যবোধ-সহ সমস্ত অনুভূতি ও বিবেচনার উপর দখলদারি কায়েম করেছে, দেবেশ-কথিত 'সাম্রাজ্য-আখ্যান'-এর চোরাবালিতে সাহিত্যের তলিয়ে যাওয়াই কি ভবিতব্য?

এই বিপন্ন প্রশ্নের মোকাবিলাই তো করে গেছেন তিনি বয়ানের পরে বয়ানে। *রক্তমণির হারে* বইয়ের 'পুরাণ থেকে পুরাণ' শীর্ষক ভূমিকার কাছেই ফিরে যাচ্ছি আপাতত। সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত 'আখ্যান' শব্দটির অর্থ দেবেশের মতে 'ঘোরালো'। কিন্তু প্রচলিত অনুষঙ্গের প্রভাবে একে প্যাঁচালো বা গোলমেলে বা অস্বস্তিদায়ক মনে যাতে না হয়, এর বহুমাত্রিকতার গৌরব ও স্পন্দনময় গভীরতার ওপর ভরসা করাই ভালো। তবে তাঁর সঙ্গে একমত হতে বাধা নেই কোনো :

> ধাতু থেকে সংস্কৃত শব্দের গায়ে লেগে থাকে খনিজচিহ্ন, সেটা কখনোই লুপ্ত হয় না, যুগযুগান্তর ব্যবহৃত হলেও না। আর, সেই খনিজ শব্দটি বাইরের আলো যতই শুষতে থাকে, বাইরের তপ্ত, নোনা বা ঠাণ্ডা হাওয়ায়-হাওয়ায় যতই সে-শব্দ হয়ে ওঠে কণা-ভাস্কর্য, ততই তাতে দীপিত হতে থাকে, নতুন-নতুন সঙ্কেত, ইঙ্গিত, নিশানা, দিশা। শব্দের তখনো অর্থ একটা থাকে বটে কিন্তু কী সে অর্থ তা আমাদের বুঝতে হয় ব্যবহার দেখে, প্রসঙ্গ দেখে।

খুবই যথার্থ এই উচ্চারণ। তবে তিনি যাকে খনিজ চিহ্ন বলছেন এবং কালান্তরের বিক্রিয়ায় যার মধ্যে 'কণা-ভাস্কর্য' ব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন, তাতেই আসলে সৃষ্টি ও মননের বিনির্মাণ-মুখর নতুন নতুন আরম্ভের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়ে থাকে। স্বয়ং দেবেশের প্রতিটি আখ্যান-প্রকল্প এর চমৎকার নিদর্শন। যদিও বাংলার মতো 'আধুনিক ভাষার ব্যবহার এতই দৈনন্দিন, বিচিত্র, অনির্দিষ্ট যে তার শব্দ বা তার বাচন থেকে খনিজতা ঝরে যায়।' (তদেব) আর, এতে অনবরত সম্পৃক্ত হতে থাকে অণু-সময় ও বড়ো সময়ের এমন কিছু অভিভব যাতে আখ্যানের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় অজস্র রূপান্তরের সূচনা হয়।

কেন 'আখ্যান'-এর পারিভাষিক দ্যোতনা আকৃষ্ট করেছে তাঁকে, *রক্তমণির হারে*-র প্রাগুক্ত প্রসিদ্ধ ভূমিকায় দেবেশ স্পষ্ট জানিয়েছেন। এই প্রক্রিয়া তাঁর কাছে শুদ্ধিলোকের দিকে যাত্রা। যে-আখ্যান তাঁর অন্বিষ্ট তা অতীতের মধ্যেও নিত্যবর্তমানকে খুঁজে নেয়। আর, বর্তমানের অন্তর্বর্তী অন্ধবিন্দুগুলিকে উদ্ভাসিত করে তোলে। কেননা সমস্ত উন্মোচনই তো মূলত মানবসত্তার হয়ে ওঠায় খচিত বর্তমানের উন্মোচন। দেবেশ এই নির্দ্বিধ উচ্চারণ করেন :

> আমরা এমন একটি শব্দই খুঁজছিলাম যা কখনো অতীতের দিকে চলে যায়— ইতিহাস, অতিকথা; যা কল্পনার আশ্রয় নেয়— উপন্যাস; যা অনেকের সঙ্গে বিনিময় গড়ে তোলে— বাচন, সংযোজন; যা কখনো-বা পাথরের মতো কঠিন ও অনড় হয়ে উঠতে পারে— সংজ্ঞা, যা কখনো-বা সমস্ত বৈচিত্র্য আত্মসাৎ করে নেয়— নাম। যা ইতিহাস, তা অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যায়। যা বিন্যাস, তাও বর্তমান থেকে অতীতে ও ভবিষ্যতে যেতে পারে।
>
> (তদেব : পৃষ্ঠা ৪)

এই মুহূর্তে বাংলা আখ্যানে বর্তমানের যে-ইতিহাস রচিত হচ্ছে তাতে যেমন অস্তিত্বের নতুন পরিসর গড়ে তোলার প্রয়াস ব্যক্ত হচ্ছে তেমনই তার সঙ্গে মিশে আছে অনিবার্য কিছু বিভ্রান্তির সংশয়, উদ্বেগ আর যন্ত্রণাও। কত গল্প লিখতে লিখতে ভেঙে যায়, জীবনের কত যাত্রা আকস্মিক ভাবে ধ্বস্ত হয়ে পড়ে। কখনো বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া উপনিবেশের দখলদারি মগজে কায়েম হয়, কখনো-বা অভ্যন্তর থেকে নানা ছদ্মবেশে আধিপত্যবাদ আমাদের আখ্যানে হস্তক্ষেপ করে। পরিচিত বাস্তবের সব ছক ভেঙে দিয়ে

অপরিচিত পালটা-বাস্তব আমাদের জীবনের গল্পগুলিকে তছনছ করে দেয়। ফলে সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দ উচিত-অনুচিত-এর ধারণা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই সব জটিল আবর্তের মুখোমুখি হয়ে কথাকার তাঁর আখ্যান-প্রকল্পকে যদি ভাঙতে শুরু করেন, তাঁর সৃজন-প্রয়াস কোথায় পৌঁছোবে তবে? জীবনের নিয়ত পরিবর্তমান তাৎপর্যের উদ্ধারই যেহেতু আখ্যানকারের অন্বিষ্ট, পূর্বনির্ধারিত কোনো মানদণ্ডের প্রতি প্রশ্নহীন বশ্যতা কিংবা প্রশ্নহীন দ্রোহ কাম্য নয় তাঁর। আজ থেকে প্রায় চোদ্দো বছর আগে, ২০০৬ সালের নভেম্বরে, খড়্গপুরে আয়োজিত একটি জাতীয় আলোচনাচক্রে সূচক-ভাষণ দিতে গিয়ে দেবেশ রায় অনবদ্য কিছু কথা বলেছিলেন। দেশভাগ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবণতা সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক ওই সমাবেশে তাঁর কথাগুলি ছিল সেরা প্রাপ্তি।

আমাদের সাম্প্রতিক সময়-পরিধি অতিদ্রুত জটিলতর হয়ে পড়ছে। ভাঙাচোরা খানাখন্দ ভরা কুটাভাসময় প্রেক্ষিত থেকে প্রতিনিয়ত আখ্যানবীজ কীভাবে আহরণ করতে পারেন সংবেদনশীল কোনো কথাকার, সে-বিষয়ে দেবেশ রায়ের গত তিন দশকের ধারাবাহিক চিন্তা অনন্ত সম্ভাবনা (সেইসঙ্গে অজস্র জিজ্ঞাসা) নিয়ে হাজির হয়েছিল শ্রোতাদের কাছে। তাঁর *উপন্যাস নিয়ে* বা *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে* বইতে যে উদ্ভাসনের বলয় তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাঁর সৃজনী উদ্যমগুলিও কেবলই নতুন নতুন দিশা সন্ধান করেছে। তাঁর *খরার প্রতিবেদন, দাঙ্গার প্রতিবেদন, শিল্পায়নের প্রতিবেদন* ও *একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন* যাঁরাই অভিনিবেশ দিয়ে পড়েছেন— তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে নিশ্চয় প্রতিবেদন-তত্ত্বের সচেতন অনুশীলন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের উদ্যম। ভারতীয় আখ্যান-পরম্পরার বহুস্বরিকতাকে কালান্তরের নির্মাণ-প্রকল্পে দেবেশ যথার্থই পুনর্বিন্যস্ত করে নিয়েছেন। কথা-আখ্যায়িকার মধ্যে পুরাণের বহুমাত্রিক নিষ্কর্ষ আবিষ্কারই যে তাঁর একমাত্র ঈপ্সিত নয় তা *মফস্বলী বৃত্তান্ত* থেকে *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত* অবধি সমকালীন সংরূপ ও অন্তঃসার উপস্থাপনার দ্বিবাচনিকতা স্পষ্ট। ভুলছি না *যযাতি* বা *তিস্তাপুরাণ*-এর প্রসঙ্গ কিংবা আরও কিছু নিরীক্ষাত্মক বয়ান। তবে *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* লিখন-নৈপুণ্যে এ সময়ের কার্নিভাল-খচিত মহাকাব্য যেখানে বাঘারু চির-অনুপস্থিত অন্তেবাসী ব্রাত্যজনের প্রতিনিধি হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক লোকায়ত চেতনার মূর্তরূপ। এই 'everyman' যেন অতলান্ত নৈঃশব্দ্যের যবনিকা সরিয়ে মধ্যমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে পাদপ্রদীপের আলোর বদলে তাকে চিহ্নিত করে পুঞ্জীভূত অন্ধকার যা যুগপৎ আস্তিত্বিক ও সামাজিক।

তিন

দেবেশ রায় আসলে আমাদের অষ্টাবক্র ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আত্মপ্রতারণা ও স্বরচিত চক্রব্যূহ থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। তিনি তার ওপর যা দেখাতে চেয়েছেন,

তা হল কৃষ্ণ ভারতের কোথাও কোনো স্থিতি নেই, নেই গতিও; নিচুতলারও সবচেয়ে অন্ধকার সবচেয়ে রূপহীন সবচেয়ে সংজ্ঞাহীন অবতলের বাসিন্দা বাঘারুর কোনো বর্তমানও তো নেই কোথাও। তার জীবনযাপনের রীতি নেই, ছাঁদ নেই কোনো; এমন কী নিশ্চিত কোনো অভিজ্ঞানও নেই তার। সে যে নিছক বেঁচে থাকে, এ বিষয়টিরও কোথাও কোনো ব্যাখ্যা নেই কিংবা এই টিকে থাকার বৃত্তান্ত জৈবিকভাবে এত স্বাভাবিক যে মানুষ হিসেবে তাকে শনাক্ত করার মতো জরুরি প্রয়োজনও হয়তো আশেপাশে-থাকা মানুষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত ও সমাজ হিসেবে পরিচিত বর্গায়তনে অনুভূত হয় না। দেবেশের প্রশ্ন তাই পাঠককেও বার বার বিদ্ধ করে, 'এ কোন হিংস্র অপারাপারযোগ্য কঠিন শূন্য দেশ' (*রক্তমণির হারে* : ভূমিকা : পৃষ্ঠা ২২)? সেইসঙ্গে এও ভাবতে হয়, 'দু-তিনটি মহাসমুদ্র ও মহাদেশ পার হয়ে-আসা বিদেশিরা নিজেদের শক্তিতে, স্বাধিকারে ও প্রশ্নহীন স্বত্বে এই দেশকে নিজেদের ক্ষমতাভুক্ত দেশ করে নেয়।' (তদেব) এমন নয় কেবল, তিস্তাপারের 'দেশ' থেকে অতিদূর নক্ষত্রলোক ময়দানবীয় বৈভব ও শক্তিমদমত্ত ইন্দ্রপ্রস্থের বাসিন্দা 'স্বদেশি' প্রভুরাও তো নিজেদের শক্তিতে-স্বাধিকারে-প্রশ্নহীন স্বত্বে তিস্তাপারে বাঘারুর ভূমিকে নিজেদের ক্ষমতাভুক্ত আপন দেশ করে নিয়েছে। প্রান্তিকবঙ্গের এই ব্রাত্য জনপদে ন্যায়-অন্যায় সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত বাস্তব-জল্পনা, আর যাই হোক, অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের ধারণা ও পরিমাপ অনুযায়ী আসে না। বাঘারুদের অধিকার-অনধিকার নিয়ে বাগাড়ম্বর করাটাও হয়তো অবাস্তব। দেবেশের নিজেরই কথামতো, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* নামক গদ্য-মহাকাব্যে, ব্রিটিশ উপনিবেশের কাছে সচেতন ও অবচেতন বশ্যতা-সূত্রে প্রাপ্ত 'নভেল' বা 'সাম্রাজ্য আখ্যান'-এর অনুসৃতি দেখি না। যেসব উপাদান দিয়ে ওই 'সাম্রাজ্য-আখ্যান' গড়ে ওঠে, তাকে এড়িয়ে যেতে হলে প্রাক্-আধুনিক পর্যায় থেকে বহমান, কখনো প্রকট কখনো হারিয়ে-যাওয়া, উপাদানগুলির খোঁজ করতেই হয়। আস্থা রাখতে হয় বাঙালির নিজস্ব কথকতার পরম্পরায়। দেবেশ এও জানেন দখলদারি শক্তির (তা বিদেশি হোক কিংবা আপাত-স্বদেশি) আনুকূল্য-পুষ্ট আখ্যান 'সাম্রাজ্য-আখ্যান' ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতএব বিকল্প আখ্যানের জন্যে চাই সজীব ও সক্রিয় উপাত্ত যেমনটি আমরা পেয়েছি তিস্তাপারের বাঘারুর উপস্থাপনায়। তবে তার কাছে পৌঁছোতে হলে অলীক বাস্তবে আপাদশির গ্রথিত দৃশ্য ও অদৃশ্য দেয়ালগুলি পেরিয়ে যেতে হয়। কাজটা এইজন্যেই কঠিন যে তাতে ভেদ করতে হয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নামে গড়ে-ওঠা অজস্র অভ্যাসের চক্রব্যূহ।

কাহিনি পরিবেশনের সূত্রে যত অনতিক্রম্য বাধ্যতামূলক উপকরণের বিন্যাস 'আধুনিকতা' হিসেবে মহিমান্বিত হয়েছে, তাদের নিরবচ্ছিন্ন পুনরাবৃত্তি দশকের পরে দশক ধরে অব্যাহত থাকায় এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিতই হয়নি : বানিয়ে তোলা কাহিনিতে আত্মপরিচয়কে কি আড়াল করতে চেয়েছেন লিখিয়েরা? নিজেদের চাওয়াটা কি শনাক্ত করা গেছে— কখনো?

নাকি দেবেশ-কথিত সাম্রাজ্য-আখ্যানের পরিশিষ্ট হতে পারাই ছিল ঈপ্সিত! গল্প তৈরি করতে করতে তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে সেইসব উদ্যমের কোনো সামাজিক উদ্দেশ্য নেই; ফলে এদের নান্দনিক সংহিতাও অস্পষ্ট। কিন্তু আখ্যান-ভাবুক দেবেশ রায় বিকল্প আখ্যানের মধ্যে পালটা-অনুভবকে বাস্তব করে তুলতে চান যা যাবতীয় আধিপত্যবাদী যুক্তিশৃঙ্খলাকে প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ তাঁর কথাবিশ্ব মূলত উপনিবেশোত্তর চেতনা-প্রস্থানে আধারিত। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* এবং *তিস্তাপুরাণ*-সহ দাঙ্গা-খরা-শিল্পায়ন-ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদনগুলি গভীর ও ব্যাপক অর্থে নন্দনের ছলে প্রতিনন্দনের মোহ বিস্তারের প্রতিষেধক। সেইসঙ্গে সমস্ত প্রাধান্যপ্রবণ কণ্ঠস্বরের প্রতিরোধ করতে করতে বেসরকারি মতাদর্শ লালিত অর্ধসোচ্চার ও নিরুচ্চার স্বরন্যাসকে উপস্থাপিত করে। এতে 'সাম্রাজ্য-আখ্যান' দ্বারা প্ররোচিত চতুর ছদ্মবেশগুলি কেবল প্রত্যাখ্যাতই হয় না, আরেক নতুন সামাজিক ও নান্দনিক সংহিতা নির্মাণ করে নিরালোক পীড়িত ব্রাত্যজনেরও নবীন আত্মপরিচয় প্রস্তাবিত হয়। বাঘারু এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। মধ্যবর্গীয় অস্মিতাবোধ দিয়ে তাকে বুঝতে চাইলে বিড়ম্বনাই তৈরি হবে কেবল। সাম্রাজ্য-আখ্যানের পরিপূরক স্বার্থের পোষকতা যাঁদের সচেতন ও অবচেতন মনে দৃঢ়মূল, তাঁরা কীভাবে চির-উপেক্ষিত ধূসর ছায়াঞ্চল থেকে উদ্ভূত ভিন্নগোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরকে কোনো পরিসর দিতে পারেন? চির-উপনিবেশিত অন্তেবাসীদের অস্মিতা-শূন্য উপস্থিতিও যে আখ্যানের প্রতিবাচন হয়ে উঠছে তা বুঝতে না পারলে এর ভাষ্যই-বা কীভাবে সম্ভব?

আখ্যান-ভাবুক দেবেশ রায় অবশ্য 'সেই গোপন, অস্পষ্ট, অন্বয়বিযুক্ত, অর্থ-এড়ানো' (প্রাগুক্ত : ৭) বিপ্রতীপ আখ্যানের অপরিমেয় গুরুত্বের প্রতি পড়ুয়াদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। খুবই তাৎপর্য-সহ তাঁর এই মন্তব্য :

> সাম্রাজ্যশক্তি এমন কোনো আখ্যানের অস্তিত্বও ভাবতে পারে না, যা, তাদের কলোনির প্রজাদের কিছু অস্পষ্ট গোঙানি, কিছু বেতাল শ্বাস-প্রশ্বাস, কিছু সুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, কিছু হাজার-হাজার বছরের পুরোনো অঙ্গভঙ্গি, জিভের কোনো আঞ্চলিক আলোড়ন, পায়ের তলার বালি-কাঁকর বা কাদার ওপর নির্ভরশীল চলন, নিবিড়পক্ষ্ম চোখে একরকমের তাকিয়ে থাকা, ঘুমোনোর ভঙ্গি, বাচ্চাকে আদরের মুদ্রা, স্তন্য দেওয়ার অভ্যাস, ব্যবহৃত শব্দের সীমা, কথা হারিয়ে ফেলা— এইসব দিয়ে তৈরি। ... যে-আখ্যানের আভাস আমরা দিতে চাইছি, তা জন্মের সঙ্গেই যুক্ত, কয়েক-জন্মের জন্মের সঙ্গে যুক্ত, জন্মচক্রের সঙ্গে যুক্ত, সেই জন্মচক্রে জড়িয়ে থাকা সম্বন্ধগুলির সঙ্গে যুক্ত।
>
> (তদেব)

এই বয়ান পড়তে পড়তে স্বতশ্চলভাবে বাঘারুর ছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে নাকি? অথচ সে যে কখনো সামাজিক রূপান্তরের মন্থনে সম্পৃক্ত হয় না, হতে পারে না এবং আধিপত্যবাদী আখ্যানের কোনো প্রতিরোধের সূচনায় কোনো ভূমিকা থাকার কথা ভাবা

যায় না— এরও বিপুল তাৎপর্য রয়েছে। কথাকার দেবেশ রায় এ বিষয়ে যেসব ইশারা করেছেন, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* থেকে তাদের শৈল্পিক-নান্দনিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক নিষ্কর্ষ নিশ্চয় অনুধাবন করা সম্ভব। বাঘারুর মতো everyman-এর 'কিছু অস্পষ্ট গোঙানি, কিছু বেতাল শ্বাস-প্রশ্বাস', 'জিভের আঞ্চলিক আলোড়ন', 'ব্যবহৃত শব্দের সীমা, কথা হারিয়ে ফেলা' সুচারু দক্ষতায় বিবৃত হয়েছে। দেশ বলতে কী বোঝায় তার সীমানা কতদূর অবধি এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা এই ব্রাত্যতম everyman-এর জাগে না কখনো। তার বেঁচে থাকায় অর্থনীতি বা রাজনীতি বা ইতিহাসের ভূমিকা কতটা তা নিয়ে মধ্যবর্গীয় পড়ুয়ার যত দুর্ভাবনাই থাক, বাঘারু সম্পর্কে সত্তাতাত্ত্বিক আগ্রহ অপ্রাসঙ্গিক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের গ্রহণের ছায়ায় তিস্তাপারের অণু-মানুষটির সময় ও পরিসরবোধ ঝাপসা হয়ে যায়। দেবেশ রায়েরই *ব্যক্তিগত ও গোপন সব ফ্যাসিবাদ নিয়ে একটি বই* (অবভাস : ২০০৬) এর বয়ান থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে বাঘারুর টিকে থাকা সম্পর্কে লিখতে পারি যে তা—

> এক প্রবহমাণ প্রক্রিয়া। তা কোনো একটি তারিখে থেমে যায়নি, বড় জোর ভাবা যায়, কোনো একটি তারিখ থেকে শুরু হয়েছে মাত্র। আমরা সেই প্রবহমাণ প্রক্রিয়াটিকেই উদ্‌যাপন করতে চাই। আমরা সেই নিয়ত পরিবর্তমান অর্থকেই উদ্‌যাপন উদ্ধার করতে চাই। আমরা সেই ভবিষ্যতের অর্থ উদ্‌যাপন করব। আমরা ইতিহাসকে অতীতে স্থির না-রেখে তাকে এখনকার জীবন-যাপনের সঙ্গে মিলিয়ে নেব। সব ইতিহাসই বর্তমানের ইতিহাস।
>
> (পৃষ্ঠা ১৩৫)

নিশ্চয়। তবে তার আগে বর্তমানের তাৎপর্য, ইতিহাসের নিষ্কর্ষ এবং সেইসঙ্গে নিরালোকগ্রস্ত ব্রাত্যজনের ভূমিকাহীনতাও যে ওই বর্তমানে ওই ইতিহাসে গোলকধাঁধার আশঙ্কা তৈরি করে তা তলিয়ে ভাবতে হবে। না, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* দেশ অভিধাযুক্ত মানচিত্র-সর্বস্ব কোনো ভূখণ্ড থেকে আপন পরিসর খুঁজে পাওয়ার অলীক বিবরণ নয়। কারণ, এতটা ইচ্ছাপূরণ ব্যবস্থা করতে চাননি দেবেশ। তিনি শুধু বোঝাতে চেয়েছেন প্রতীচ্যের নভেল নামক ধারণার প্রতি আনুগত্য বাঙালিকে স্মৃতিভ্রষ্ট ও শিকড়চ্যুত করেছিল। বানিয়ে-তোলা কাহিনি যেমন পাঠককে ক্রমাগত মনোরঞ্জক সত্যভ্রমের পিঞ্জরে রুদ্ধ করেছে, তেমনই নায়ক বা নায়িকার অলীক ভাবমূর্তির নিশ্ছিদ্র উপস্থাপনায় অবান্তর হয়ে পড়েছে প্রকৃত বাস্তব। মধ্যবর্গের হিসেবি মাঝারিয়ানায়, চতুর সমঝোতার প্রক্রিয়াকে নিরঙ্কুশ করে তোলায়, প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি মতাদর্শের প্রতি প্রকট ও প্রচ্ছন্ন সমর্থন ব্যক্ত করায় অনিবার্যভাবে সেইসব কাহিনিও তাদের কুশীলবেরা স্থিতাবস্থার ধ্বজদণ্ড বহন করেছে। বাঘারুর মতো ঊনমানবের জন্যে তাই পুরোপুরি নতুন ধরনের আখ্যান-প্রকল্প অপরিহার্য। বস্তুত *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* যেন জীবন ও জগতের পুঞ্জীভূত নিরালোক ও

গতির অবভাস সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রশ্নমালা ও প্রত্যুত্তরের নির্মিতি। এখানে মনে পড়ে বিশ শতকের প্রশস্যতম আখ্যান-ভাবুক মিখায়েল বাখতিনের সেই প্রসিদ্ধ মন্তব্য : 'There cannot be a figure without a ground'। কোন পরিধিশূন্য জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছে বাঘারু, কী তাঁর ছায়াচ্ছন্ন অস্তিত্বের সমাজতত্ত্ব : এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেই লিখেছেন দেবেশ। *রক্তমণির হারে*-র সেই প্রসিদ্ধ ভূমিকায় তিনি আখ্যানের অর্থকে বৈপরীত্যময়, সংঘর্ষ সংকুল ও রহস্যাকীর্ণ ভেবেছেন, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে সংজ্ঞার নিষ্কর্ষ এবং ইতিহাস-গল্পকথা-পুরাণের সঞ্চালক সংবিদ। তবে তিস্তাপারের বাসিন্দা বাঘারুর আখ্যানকে বাঙালি-ভারতীয়ের নিজেকে খোঁজার আখ্যান বলা যায় কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কেননা সুস্পষ্ট নাম-পরিচয় যে-ব্রাত্যজনের নেই, 'দেশ'-এর ধারণা তো পুরোপুরি তার আয়ত্তের বাইরে। আরও একটি কথা এবার না লিখলেই নয়। উত্তরবঙ্গের আরণ্যক জনপদে যার উপস্থিতি বুদ্‌বুদতুল্য, 'ভারত' নামক মানচিত্রসর্বস্ব অভিজ্ঞানে তার দাবি কতটুকু? আর, হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান সমীকরণের পক্ষপাতী বিবেক-ভ্রষ্ট দেশে বাঙালি-সত্তা যেহেতু ক্রমবর্ধমান ক্রূরতায় আক্রান্ত হয়ে চলেছে— ভারতীয়তার খোঁজ কি দেশ-বিভাজন দ্বারা প্রান্তিকায়িত বাঙালির পক্ষে আত্মপ্রতারণা নয়? বাংলা ভাষা যাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যম, তাঁরা কি কখনো আত্মবিভাজনের প্রক্রিয়াকে শনাক্ত করেছেন আখ্যানে? আত্মপ্রতারণা যখন প্রাতিষ্ঠানিক অতিনাগরিকতার প্রশ্রয়ে অন্ধতার বলয়ে দৃঢ়প্রোথিত হচ্ছিল, অমিয়ভূষণ মজুমদার কথিত 'অ্যাংলো-স্যাক্সনি মুখোশ' খুলে ফেলার তাগিদ ক-জনের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল? চলমান ইতিহাসের পুঞ্জীভূত ছাইয়ের গাদায় যে-বাঘারুদের অস্তিত্ব চাপা পড়ে থাকে, তাদের বর্তমান ও পুরাণকে ওই অলীক ভারতীয়তার ভাবপিঞ্জর থেকে মুক্ত করে ক-জন দেখাতে চেয়েছেন? *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-এর দেবেশ রায় নিঃসন্দেহে বিরল ব্যতিক্রম।

চার

ব্রাত্যজনের ওই আখ্যানে কি 'বাঙালি-ভারতীয়' বাস্তব-এর আদল পাই? কথাকার দেবেশের 'সচেতন চেষ্টার ভিতরে তাঁর অচেতন বা অবচেতন শিল্পবোধের ফলে' (*রক্তমণির হারে* : ভূমিকা : পৃষ্ঠা ১৯) কি 'কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পরিধির' আখ্যান গড়ে উঠেছে যার সূত্রধার বাঘারু? প্রান্তিকায়িত সত্তার কোনো বিশিষ্ট 'নৈতিকতা'-র প্রতিনিধি বলে কি তাকে গ্রহণ করতে পারি? এই প্রশ্নেরই মীমাংসাও স্বয়ং দেবেশ যোগান দিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের শিকার হিসেবে—

> কলোনির প্রচলিত ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির যে-কোনো চেষ্টাই এক সাম্রাজ্যবিরোধী চেষ্টা। সেই চেষ্টার মধ্যে যে-আত্মসন্ধান থাকে তা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে, সে-কেন্দ্র কলকাতাই হোক আর প্যারিসই হোক, নিরবলম্ব হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি

সে-কেন্দ্রে এতই প্রকট, সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আদবকায়দা সেখানে স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি ও কথাবার্তা এমনই ভুলিয়ে দেয় যে আখ্যান এমনকী মানবিক বাস্তবও হয়ে ওঠে না, সামাজিক বাস্তব বা ব্যক্তিবাস্তব তো অনেক দূরের কথা। আবার, সেই পরিধি যখন মানবিক ও ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে তখন সেইসব মানুষ, নিসর্গ ও দিনরাত্রি কেন্দ্রের বিপরীত এক অন্বয় অনিবার্যত পেয়ে যায়।

(ভূমিকা : তদেব : পৃষ্ঠা ২০)

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-এ যেমন বাঘারু তার তিস্তাপারের নিসর্গ, তাকে ঘিরে প্রবহমাণ দিন-রাত্রি এবং ভাঙাচোরা মানুষজনের বিকেন্দ্রায়িত সমাজ-সহ আগ্রাসী আধিপত্যবাদের 'বিপরীত এক অন্বয় অনিবার্যত পেয়ে' গেছে।

বাঘারু যেখানে থাকে (বসবাস করে এমন লেখা যাচ্ছে না) তা যথার্থই 'ছকহীন মানচিত্রহীন পথহীন পরিমাপহীন মালিকানাহীন'। তাতে কোনো সম্পর্কই স্থির নয়, আসলে সম্পর্ক (ব্যক্তিগত ও সামাজিক) তৈরি হওয়ার মতো পরিসরই তো নেই। অধিকার-অনধিকার ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে বোধ জেগে ওঠার মধ্যে বস্তুগত ভিত্তিও অনুপস্থিত। বহুমাত্রিক এই অনুপস্থিতিও যে সার্থক আখ্যানের উপাত্ত হতে পারে এবং সঞ্চারিত করতে পারে নিরুচ্চার আর্তিকে, দেবেশ অনুপম দক্ষতার সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি শুনতে পেরেছেন প্রান্তিকায়িত বর্গের অপরিমেয় নীরবতার ভাষা। তাই তো ইচ্ছাপূরণের কল্প-নির্মিতি অথবা আধা-মূর্ত আধা-বিমূর্ত 'গল্পকথা' এই লোকায়ত মহাকাব্যোপম বয়ানে পাই না। বরং কথাকার আবহমান কাল ধরে অনাদৃত, উপেক্ষিত ও অনালোচিত, নিচুতলারও নিম্নতম সোপানে অবস্থিত, আদি-বঙ্গীয় গণ-মানুষের সন্ধান করেছেন। গণ-মানুষের এই প্রতিনিধি-সত্তার আপাত-রৈখিকতার অন্তরালে রয়েছে দেবেশ-কথিত 'সংজ্ঞা ও কল্পনা, ইতিহাস ও উপন্যাস, পুরাণ ও বর্তমান'-এর যুগলবন্দি উপস্থিতি। বাঘারুকে কখনো পূর্ব-নির্ধারিত মধ্যযুগীয় ভাবনা-প্রকরণ-এর বিলম্বিত প্রচ্ছায়ার দাপট মেনে বোঝা সম্ভব নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলিত আখ্যানের অনুপুঙ্খ-বহুল বিন্যাস-পদ্ধতির কালোপযোগী সংস্কার করে দেবেশ সম্পূর্ণ বিকল্প মানব-পরিসর নির্মাণ করেছেন তাঁর বৃত্তান্তে। শব্দ কীভাবে 'কণা-ভাস্কর্য' হয়ে ওঠে তা জানেন বলেই বাঘারুর উপস্থাপনায় এর অসামান্য ব্যবহার করতে পেরেছেন। বাঘারু তো তাঁর কাছে নিছক আখ্যানের কুশীলব নয়, সে আসলে নৈঃশব্দ্য-আবৃত অনাবিষ্কৃত সাংস্কৃতিক বৃহৎবঙ্গের প্রতীকী সংরূপ। তাকে ঘিরে যে-মন্থর ও গুরুভার জীবনসত্যের সামগ্রিক উন্মোচন ঘটে, সে নিজে কখনো তাতে সম্পৃক্ত হয় না। এই যে বিচিত্র অসংলগ্নতার সন্নিবেশ, তাতে কোনো 'নতুন নতুন সঙ্কেত, ইঙ্গিত, নিশানা, দিশা' ব্যক্ত হয়েছে কিনা— তা শুধু নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়েই বুঝে নেওয়া সম্ভব।

বাঘারুর যথাপ্রাপ্ত অবস্থান দ্বিবাচনিক কল্পনার অন্বিষ্ট হতে পারত শুধুমাত্র সুচিন্তিত ও সুরচিত সেই আখ্যানের নতুন ধরনে যা এক সঙ্গে নাম, সংজ্ঞা, ইতিহাস, উপন্যাস,

বাচন, সংযোজন, অতিকথা। এবং প্রায়োগিক সাংস্কৃতির নৃতত্ত্বের প্রতিবেদনও। অথচ বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত ধরনে এতসব 'ভার' বহনের রেওয়াজ সাধারণত দেখাই যায় না। বরং সূচনা-পর্ব থেকে বাংলা উপন্যাসের কাহিনি ও কুশীলবেরা ঔপনিবেশিক আত্মবিনাশের অনুকূল ছদ্ম-নান্দনিকতায় গড়ে উঠেছে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার বাইরে যদি যেতে চান কোনো কথাকার, তাঁকে বিকল্প সংযোগের শিল্পিত প্রকরণ নিয়ে ভাবতেই হবে। চেনা-জানা পরিসরের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে অজানা পৃথিবী, বাচনের নতুন বিন্যাস, বিবরণের অচেনা আকল্প। আবিষ্কার করে নিতে হবে 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির-বিন্দু'। যে-মানুষটি খুব কাছে থেকেও নজরের বাইরে, অলঙ্ঘ্য দূরত্বে— তার জীবনের পরিসরহীনতার মধ্যে নিহিত 'গল্প' খুঁজে নেওয়ার মধ্যে মিশে যাবে উপনিবেশের চক্রব্যূহ শনাক্ত করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসারও তাগিদ। দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্ষমতাকেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অর্ধস্ফুট ও অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হবে আখ্যান-গ্রন্থনার নতুন ধরনে। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* সেই ধরনেরই অনন্য দৃষ্টান্ত যেখানে কথাকার আখ্যানের এমন আদল ধীর-মন্থরভাবে ব্যবহার করেছেন যা খুব আঁটোসাঁটো নয়, একটু ঢিলেঢালা। আর, এর বাক্‌বিন্যাসে—

> কল্পনা ছড়িয়ে আছে, আবার সেই কল্পনাকে সত্য করে তোলার একটা বাস্তব চেষ্টা ও শ্রম জড়িয়ে আছে... (যার) ভিতর একটা ধারাবাহিকতার প্রবাহ আছে অথচ সে-প্রবাহের শাখা-বিস্তারও আছে; (যা) কখনো-কখনো একটি প্রধান অর্থকে স্পষ্ট করে তোলে, আবার কখনো-কখনো এক বা একাধিক অপ্রধান অর্থ সেই প্রাধান্যকে দাবিয়ে দেয়... (যার) ওপর দখলদারি কায়েম করতে পারে সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো শক্তি আবার সেই দখলদারি থেকে... (তাকে) মুক্ত করতেও ঘটে যেতে পারে কোনো সমাবেশ।

দেবেশের এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাঘারুর নির্মাণেও সক্রিয় রয়েছে এর পরিপোষক আখ্যান-প্রকল্প যার আসল জোর ওই ধারাবাহিকতার প্রবাহে আর সেই প্রবাহের শাখা-বিস্তারে। তবে সংবেদনশীল পড়ুয়াকেই ঠিক করে নিতে হয়, এর 'প্রধান অর্থ' কোথায় এবং কীভাবে ব্যক্ত হচ্ছে; অপ্রধান এক বা একাধিক অর্থের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য কতদূর অবধি গ্রাহ্য? এটাও ঠিক, দুশো আঠারোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই মহাকাব্যের আখ্যানের চোদ্দো-সংখ্যক বয়ানে বাঘারুর সঙ্গে পাঠকের ঈষৎ নাটকীয়ভাবে দেখা হয়। কোথাও কার্নিভালের মেজাজ আভাসিত হয় যেন। 'ফরেস্টারচন্দ্রের আত্মঘোষণা' শীর্ষকে তার উপস্থাপনাও সংকেত-গর্ভ : 'হুজুর, মুই আসি গেছু, মুই ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মণ।' এত শাখা-বিস্তারও অজস্র অনুষঙ্গ বিন্যাসের মধ্যে লেখক যে অনেকার্থদ্যোতক বাচনের পরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাতে কুশীলবের যথাপ্রাপ্ত অবস্থানের গুরুত্ব স্পষ্ট। বাঘারুর আস্তিত্বিক তাৎপর্য প্রকট করার জন্যেই প্রথম তেরোটি পরিচ্ছেদের আয়োজন। গণমানুষ ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের অন্যোন্য-নির্ভর অন্তর্বয়ন ছাড়া বাঘারু এত

আকর্ষণীয় হত না। 'হাট কত রকমের হয়' শীর্ষক পরিচ্ছেদও বিশেষ ধরন এই বয়ানের জন্যে আবশ্যিক, যার উপসংহারে যেন অজস্র অনুপুঙ্খ-বিন্যাসের যৌক্তিকতায় সম্পৃক্ত বাঘারুর বিশ্বাস্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় :

> আর এই সবের ঘনিষ্ঠ আড়াল থেকে মানুষের সমবেত কণ্ঠ প্রবল হয়ে ওঠে। সেই কণ্ঠের কোনো আওয়াজের কোনো অর্থ করা যায় না, কোনো একটি ধ্বনিকে আলাদাও করা যায় না, সমস্তটাই হয়ে ওঠে ধ্বনির প্রবাহ প্রায় নদীস্রোতের মতো। নদীস্রোতের মতোই নেপথ্যের সেই প্রবল বর্তমান তার উচ্চতম কোলাহলের জোরেই একটা অস্তিত্ব হয়ে ওঠে।

বাঘারুর বহুস্বরিক অস্তিত্বের নিষ্কর্ষ 'নেপথ্যের সেই প্রবল বর্তমান'-এর সঙ্গে যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, দেবেশ তা আখ্যানের নিজস্ব শিল্পভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'ভেতরের অন্ধকার থেকে বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে' থাকে সেখানকার মানুষজন ও অন্য সব প্রাণী— সেই পরিসরের বহুমাত্রিক জৈবিক ও আস্তিত্বিক অন্ধকারেই বাঘারু বর্মণের উদ্ভব ও বিকাশ। বিপুলাকৃতি গদ্য-স্থাপত্যে সাধারণত এমন ইঙ্গিতগর্ভ বাচনের সমারোহ দেখা যায় না যা চারশো একানব্বুই পৃষ্ঠা ব্যাপ্ত *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-এ বার বার লক্ষ করি। সবশেষে দুশো উনিশতম পরিচ্ছেদে যে পরিশিষ্ট রচিত হয়, তার শিরোনাম 'এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ।' এতে বাঘারুর অস্তিত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য নিয়ন্তা লেখকের বাচনে স্পষ্ট হয়েছে।

পাঁচ

সতর্ক পাঠক ঈপ্সিত অভিনিবেশ দিয়ে বুঝে নিতে চান, কথাকার কেন লিখেছেন :

> এ বৃত্তান্তে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনাকে বা ইতিহাসকে নথিভুক্ত করা হয়নি। বরং বারবার এই বৃত্তান্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনো ঘটনা বাইরে কোথাও ঘটে গেছে, হয়তো ইতিহাসও হয়ে গেছে। উপন্যাসের মতো এইসব ব্যারেজও তো একটা সৃষ্টিকর্ম। তাই সৃষ্টির যুক্তিতে এ দুই ঘটনা, এই ব্যারেজ আর এই বৃত্তান্ত, একই জায়গায় ফিরে ফিরে আসছে।

এই যে প্রত্যাবর্তন, তাতে প্রাকৃতিক ও মানবিক নিসর্গ কীভাবে অন্বয়ে-অনন্বয়ে আখ্যানের আধেয় হয়ে উঠছে— তা বুঝতে পারলেই কেবল বাঘারু স্পষ্টতর হবে। বস্তুত আখ্যান শেষ হয়ে যায় যে-বিন্দুতে সেখানে বাঘারুর যাত্রা সমাপ্ত হয় না। পরিশিষ্টতে যে-বাঘারুকে দেখি, সে ক্রমেই পিছিয়ে যায়; আসলে তাকে 'পিছিয়ে যেতে হয়, ক্রমেই সরে যেতে হয়, ক্রমেই দূরে যেতে হয়।' তার মিছিলের মধ্যে ঢুকে যাওয়া, সোজা আলোর দিকে হেঁটে যাওয়া : এইসব ক্রিয়াপদের দ্যোতনা পাঠককে লক্ষ করতেই হয়। তেমনই

জোনাকির ভেতরে অন্ধকার দিয়ে তৈরি বাঘারুর শরীর, মাদারির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ : এইসব তো নিছক বিবরণের অনুপুঙ্খ নয়, চিহ্নায়িত উপস্থাপনা। তাকে পাঠক চিনে নিতে পারছেন কিনা, এইটেই বড়ো কথা। লেখক-স্বর কিন্তু সংশয়-রহিত; 'আকাশের অবান্তর অত তারা সত্ত্বেও তো নানা তারার অন্তর্বর্তী অন্ধকার দিয়ে তৈরি কালপুরুষ বা সপ্তর্ষি চিনে নিতে ভুল হয় না।' আপাতভাবে অতিশয় অলক্ষগোচর বাঘারু কি তবে অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কোনো কালপুরুষ যাকে দ্যোতিত করছে পুঞ্জীভূত নেতি ও অনস্তিত্বের সমবায়ী উপস্থিতি? এই বাচনে দেবেশের অভিপ্রায় স্পষ্ট। মাদারি যে মিছিলচ্যুত ও সর্বস্বহারা নদীহীন মানুষটিকে মমতায় জড়িয়ে ধরে, তাতেই তো চূড়ান্ত অন্তেবাসীজনের সম্পর্কের গ্রন্থনাকে উপলক্ষ্য করে নব্য আখ্যানের প্রকল্প রচিত হয়ে যায়। আরও লক্ষ করি, 'আমরা বাঘারু-মাদারিকে আর অনুসরণ করব না'— এই ঘোষণার পরেও থেমে যাননি কথাকার। বাঘারুর ওই শেষের-পরের-শুরুতে সে যেন যুগপৎ সম্ভাব্য নতুন ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সূত্রধার ও নাকিব। সাম্প্রতিক কালে উন্নয়নের অর্থনীতি যে নিশ্চিহ্নায়নকে সর্বগ্রাসী করে তুলেছে, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মণ তারই প্রতিনিধি। তবু *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* যেহেতু উপন্যাসের বলয় থেকে আখ্যানের প্রতি সঞ্চরমান, প্রত্যাখ্যানের সূত্রেই কথাকার তার মধ্যে আরেক সম্ভাবনার ইশারা জাগিয়ে দিয়েছেন। অতএব পরিশিষ্টের সমাপ্তিসূচক বাক্যেও আভাসিত হয় সমাপনবিহীন যাত্রার সংকেত— সেই যাত্রা একক ব্যক্তির নয়, সামূহিক গণমানুষের। অতএব সোচ্চার হয়ে ওঠে এই বার্তা; 'এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক...'

হ্যাঁ, 'মানুষের সমবেত কণ্ঠ প্রবল হয়ে ওঠে' বাঘারুর এই বিশিষ্ট উপস্থাপনায়। আগেই লিখেছি, দেবেশ বিপুল অভিনিবেশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের গঞ্জগ্রাম ও তার ব্রাত্য জীবনকে প্রতীকায়িত করে তুলেছেন। হাটের চালাঘরগুলিকে ঘিরে থাকা বহুমাত্রিক অন্ধকার তাই তাঁর আখ্যানে আলাদা গুরুত্ব পায় :

> লম্বা সারির নির্জনতায় কুপির শিখা কাঁপে, মাটির হাঁড়িতে লালচে বৃত্ত দোলে, গোল গোল মাপ-মতো ছায়ারা হাঁড়ির বর্তুলে ছলকে-ছলকে যায়— যেন অন্ধকার, জলের মতো তরল।

কথাকার বাঘারুর মধ্যে ব্রাত্যজনের ভিড়ের মুখই খোঁজে যাতে 'রেখা রঙ আর অঙ্গ-সংস্থানে কোনও নতুনত্ব নেই, একটি মুখোশ থেকে আরেকটি মুখোশ আলাদা করা যায় না, অথচ প্রতিটি মুখোশই আলাদা হয়ে যায় অনিবার্য।' বস্তুত এই অনিবার্যতায় বাঘারুর অস্তিত্বও গ্রথিত। নিরন্ধ্র অন্ধকারের জীবন তাকে মুখোশ থেকে মুখ হতে দেয়নি। কিন্তু তার এই অপরিমেয় রিক্ততা নিয়েই সে নৈঃশব্দ্য মন্থন করে সজীব অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে। বাঘারুর অভিজ্ঞানহীন সত্তা নিরবচ্ছিন্ন উন্মোচনের আবহ রচনা করে শুধু। এর মধ্যে যেন অজস্র সূচনা-বিন্দুর সমাবেশ লক্ষ করি; উপন্যাসীকরণের অজস্র ভনিতায়

তার অভিধা ও সংরূপ কোথাও স্থির থাকে না। সেইজন্যে ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মণের ইতিকথাও শেষ হয় না কোথাও।

তিস্তাপারের বাঘারু তার গায়ে অন্ধকারের এক পুরু পলেস্তারা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর টলতে থাকে। যে-পরিসরে রাত্রি ও অন্ধকার সবটুকু ব্যেপে থাকে সেখানে ডুবোমানুষের মতো বাঘারুর চলাচল। সে শুধু অন্ধকারকে আরও অন্ধকার, নীরবকে আরও নীরব করে তুলতে পারে। তার বাঁ-পাছা আর পিঠের ডান দিকে 'বাঘের দুইখান থাবার দাগ'। এ যেন বাঘারুর আস্তিত্বিক অভিজ্ঞান যাকে কোনোরকমে টিকে থাকতে হয় বহুবিধ আতঙ্ক সইতে সইতে, বেঁচে থাকার জন্যে অজস্র বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে। এই যুদ্ধ যেমন জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে, তেমনই আপাত-সভ্য সমাজের দখলদার শক্তির প্রতিনিধি জোতদারের সঙ্গে। এ যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তবু এই নিয়ে বাঘারু তার নিজস্ব আমোদ খুঁজে নেয়। নাচের ভঙ্গিতে সে ঘুরপাক খায় আর খিলখিল হাসিতে চারপাশের অনুপস্থিত ভিড়ের উদ্দেশে বলে, 'সগার পাছা ঢাকা থাকিবে। সগার পাছাত হাগা আছে, বাঘা নাই। কিন্তুক মুই সাচা ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মণ— আদি। মুই মোর পাছাখান এ্যানিং উদলা করি দিম। খাড়াও হে হুজুর।' এই ব্রাত্য ভাষায় একমাত্র ব্রাত্যজনেরাই কথা বলতে পারে। তবে এখানে পাঠক দেখতে পান রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি অন্তেবাসীর নিজস্ব কার্নিভালীকৃত চাপা ধিক্কার ও প্রত্যাখ্যান। জমি-জেরাতের সঙ্গে তিস্তাপারের বাঘারু আর গয়ানাথদের কী বহুমাত্রিক সম্পর্ক, তা জরিপের কাজে-আসা মানুষজন বুঝে উঠতে পারে না কখনো। রাষ্ট্রের সংঘশক্তির কনিষ্ঠ প্রতিনিধিদের কাছে তিস্তাপারের ভূগোল নিছক বহির্বৃত ও প্রত্যাখ্যাত অপর হয়েই থাকে। বাঘারুরা কিন্তু প্রকৃতির অন্য-সব সন্তানের জীবন-যাপনে সম্পৃক্ত হয়ে সময়ের দুর্বোধ্য পরিবর্তনগুলির দিকে তাকায়। তাকায় যদিও, দেখে না কিছুই। তবে এই তাকানোয় এবং চতুর্দিকে সংযোগহীন কথার তোড়ে ওদের কিছুই বদলায় না।

পাঠক বরং লক্ষ করুন লেখক-স্বরের কিছু কিছু ইশারা :

> নেংটিপরা ঢ্যাঙা শরীরটা নিয়ে... এই বাঘারুটাও একটা পুরোনো শালগাছের মতো— তার শ্যাওলা-ছাতা ধরা শরীরে সবাইকে আড়াল করেই তাকে দাঁড়াতে হয়। এমন-কি তার নেংটিটাও তার শরীরের সঙ্গে এমনই মিশে আছে যে বাঘারু যেন সত্যি একটা গাছই। কৃষক-মজুরের সমাবেশেও বাঘারু বেমানান।... এত বড় একটা বাঘারু, তার শরীরের চামড়া গাছের বাকলের মতো, মুখে-চোখে কোনো ভাষা নেই, মাথার চুলের আলাদা রং নেই। সত্যি এখানে চলে না।

তার জিপে চড়াও হয়ে ওঠে বর্গ-বিভাজিত সামাজিক অবস্থানের চিহ্নায়ক। তার উপস্থাপনা গূঢ়ার্থবহ :

> তার লম্বা, পেশল, নগ্ন, রোমহীন, বাঁ-পা-টা জিপের পেছনে শূন্যতার ফ্রেম জুড়ে অনেকক্ষণ থাকে। তার মাটিলেপা, থ্যাবড়া, হুকওয়ার্মের ফুটোয় দাগি পায়ের তলাটা খুব সাদাসিধে সোজা টাঙানোই। যেন, ওখানে, পোস্টারের মতো।

কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ সম্ভবত ন্যাংটো শরীরে এম এল এ-কে কাঁধে নিয়ে বাঘারুর নদী পার হওয়া। এই চিহ্নায়িত বিবরণেই সম্ভবত একালের নতুন পুরাণকথা রচিত হয়ে যায় যা আসলে পুরাণের লোকায়ত কার্নিভাল স্পৃষ্ট নবজন্ম। এর আগে এ্যামোলিয়া (এম এল এ) সাহেবের কাছে বাঘারু যেভাবে নিজের নাম বড়ো হয়ে যাওয়ার কথা বলে, তাঁর তুলনা বাংলা আখ্যানে কমই আছে। তার সমস্যা সে এভাবে বিবৃত করে!

> মোর নামখানি বাড়ি যাচ্ছে। ... যত টাইম যাচ্ছে, মোর নামখান শলসল করি বড় হয়্যা যাচ্ছে। এ্যালায় এ্যাতখান বাড়ি গেইছে যে ঐ নামখানে মুই আর আটো না। ঢলঢলাচ্ছে।

বাঘারুর চোখে জীবন-জগৎকে দেখেন না নিশ্চয় মধ্যবর্গীয় পাঠকও। যে কার্যত জন্তুর স্তরে বিচরণ করে, সে কিন্তু দৃষ্টিহীন নয়। বস্তুত দেবেশ রায়ের দ্রষ্টা চক্ষুতে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে গয়ানাথ রায়বর্মণ ওরফে গয়া জোতদার সম্পর্কে বাঘারুর বক্তব্য খুব লক্ষণীয় :

> গয়ানাথ ত মোক নাম দিছে বাবু। গয়ানাথ মোর মাও-এর দেউনিয়া, মোর দেউনিয়া, জমির দেউনিয়া, ফরেস্টের দেউনিয়া, তিস্তা নদীর দেউনিয়া, ভোটের দেউনিয়া। তা ধরো, এ্যানং একখান ভোটের আগত কহিল, হে বাউ, ভোটত তর নামখান দিয়া দিছু।

তার বাঘ-মারার গল্পও চমৎকার। সব মিলিয়ে 'কুড়ানির ছোয়া, কুড়ালিয়া কোটা, বাঘারুয়া, ফরেস্টয়া, চন্দ্র বর্মণ' নামক ব্রাত্য মানুষটির কথা উপকথার স্বভাব অর্জন করেছে। তার ছোটো নাম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তাৎপর্যপূর্ণ। এম এল এ-কে সে বলে : 'মুই না চাও পালাটিয়া-গান। নামের পালাটিয়া খান, ঢলঢলাচ্ছে, খলখলাচ্ছে। মোক একখান মানষির নাম দেন।' টুকরো-মানুষ থেকে পুরোপুরি 'একখান' মানুষ হয়ে ওঠার সাধই— বাঘারুকে নামের জন্যে তৃষ্ণার্ত করে তোলে। আর, এখানেই আখ্যানের ভাবনাবৃত্তও নিজেকে চিনিয়ে দেয়। বিশ শতকের চতুর্থ পাদের (১৯৭৬–২০০০) অন্যতম পুরোধা তাত্ত্বিক মিশেল ফুকোর চমৎকার এই মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

> Discourse is not simply that which translates struggles or systems of domination, but is the thing for which and by which there is struggle discourse is the power which is to be seized.
>
> (১৯৮৪ : ১০৯-১১০)

কিন্তু ফুকোর এই মন্তব্যের শেষ অংশটুকু *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* সম্পর্কে কতটা প্রযোজ্য হতে পারে? বাঘারুর উপস্থাপক কথাকার কি তার অজ্ঞাতসারে ঘটে-যাওয়া সংঘর্ষ এবং সর্বব্যাপ্ত আধিপত্যের ক্রমবর্ধমান স্থূলতায় পাঠকের জন্যে কোনো সূত্র রেখে গেছেন সম্ভাব্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার? কার্নিভাল-তত্ত্বে যে দেখতে পাই, নিচুতলার অবজ্ঞাত অস্তিত্ব বহুদিনকার সাফল্যভোগী উঁচুতলার সুযোগ-সন্ধানীজনদের অবস্থানচ্যুত করে— অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের চক্রব্যূহে রুদ্ধ ব্রাত্যজনেরা কি আদৌ সেই প্রক্রিয়ার নিয়ামক হতে পারে? সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবের প্রচলিত সংহিতায় তা কি আদৌ সম্ভব। এইসব জিজ্ঞাসার মীমাংসা অবশ্য পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন দেবেশ। বর্ণবিভাজিত বাঙালি হিন্দু সমাজে বাঘারু বর্মণই কেবল অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, বরিশালের যোগেন মণ্ডলও তা-ই। অবশ্য বাঘারু কল্পনার নির্মিতি কিন্তু ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলার নমঃশূদ্রদের অবিসম্বাদী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ইতিহাসের বাস্তব মানুষ। *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* ও *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* দুটি ভিন্ন ধরনে উচ্চারণের সামাজিকতায় ঋদ্ধ ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের অভিব্যক্তি। দেবেশ রায় স্বয়ং যে 'পারিবারিক শূদ্র প্রচ্ছায়া'-র কথা জানিয়েছেন তা ইতিহাসের নিরেট দেওয়ালে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হওয়ার পরে পাঠকের চিন্তাজগতে কতখানি উদ্ভাসন ঘটিয়েছে, এর পরিমাপ বহুদিন ধরে করে যেতে হবে। যে-পাঠকৃতি প্রতীচ্যের 'বিলভুঙ্গসরোমান' প্রজাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা স্তরে স্তরে উন্মোচিত হওয়ার ফলে সত্যিই কি কোনো 'শিক্ষা' পাই? 'শিক্ষা' নিতে সত্যিই কি প্রস্তুত সামূহিক আত্মবিস্মৃতিতে নিমজ্জিত বাঙালি?

এই প্রতিবেদক তেমন কোনো অলীক ভারতের আত্মপ্রতারক কল্পনায় আগ্রহী নয় যা আমাদের আবহমান ইতিহাসকে নস্যাৎ করে। বিশেষত হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থানের ফ্যাসিবাদী সমীকরণের দম্ভে ভারত যেহেতু মানচিত্র সর্বস্ব ও ধর্মান্ধ দৈনিক পিশাচের মৌলবাদী হিংস্র তাণ্ডবের বধ্যভূমিতে পরিণত ইদানীং। বস্তুত 'শক-হুন-দল পাঠান-মোগল একদেহে লীন' হয়ে যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছিল, দেশভাগের কালবেলায় তার ওপর আর্যাবর্তপন্থীরা তাদের দখলদারি কায়েম করেছিল। বিশেষত গত ছ-বছরে জাতিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা যেভাবে রাষ্ট্রশক্তির গোত্রচিহ্নে পরিণত হয়েছে, তাতে বহুশতবর্ষের ভারতীয়তার সাধনা শকুন ও হায়েনার খাদ্য হয়ে পড়েছে। এসময় কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! দেশভাগকে বাঙালি বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়ে দিয়েছে অথচ তা-ই ছিল অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক সম্পদে গরীয়ান, রেনেসাঁসের মানবচৈতন্যে ঋদ্ধ জাতির আদিপাপ। ফলে ফ্যাসিবাদী জমানায় মিথ্যা ইতিহাস অহরহ রচিত হচ্ছে। এই আদিপাপকে সাম্প্রদায়িক মড়কে রূপান্তরিত করার জন্যে ধর্মান্ধ অপশক্তির লেজুড়ে পরিণত হয়েছিল যারা, ইতিহাসের আস্তাকুঁড় থেকে তাদেরই ইদানীং কুড়িয়ে আনছে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদী

শাসকগোষ্ঠী। জাতির ত্রাতা যিনি হতে পারতেন, সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যাবৃত অন্তিম জীবনকে কৃতঘ্ন বাঙালি রেখে দিয়েছে যবনিকার অন্তরালে। সুতরাং বরিশালের যোগেন মণ্ডলকে পুনরাবিষ্কার করার উদ্যম কত বহুমাত্রিক তাৎপর্যসম্পন্ন তা কি সত্যিই বুঝতে পারি আজ?

সহস্রাধিক পৃষ্ঠা (১০৯৫) ব্যাপ্ত জীবনী-উপন্যাসের অগাধ জলে কেন ডুব দিতে চাইবেন পাঠক তা-ই প্রথমত উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দেশভাগ নামক বাঙালির প্রতিকারহীন আদিপাপ নিয়ে বহু শিবির ও অজস্র ভূগোলে বিভক্ত বঙ্গজদের ন্যূনতম অস্বস্তি তো ছিলই না; তার ওপর আর্যাবর্ত থেকে ধেয়ে আসা হিন্দুত্ববাদী মহাপ্লাবন এবং মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রিত ইসলামি আঁধির সাঁড়াশি-আক্রমণে বাঙালি আর বাঙালি নেই। হিন্দুয়ানি ও ইসলামিয়ানা আমাদের যাবতীয় চিত্তসম্পদকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। মননে স্বরাজ অর্জনের কোনো উদ্যমই আর অবশিষ্ট নেই। এসময় বরিশালের যোগেন মণ্ডলের জীবন কথা বিষয়ক মহা-উপন্যাস পড়ে আমরা কী ইতিহাস পুনর্নির্মাণে উদ্যোগী হব? ইতিহাসের অন্ধবিন্দুগুলি কি একুশ শতকের সাম্প্রতিক চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে শনাক্ত করতে চাইব আদৌ?

বরিশাল কবি জীবনানন্দ ও মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের উৎসভূমি নয় কেবল, বিষাদময় স্বপ্নেরও আকর। আমাদের স্বপ্নসম্ভব রূপসী বাংলা যোগেন মণ্ডলের মধ্যে কোনো মেগাস্থিনিসকে খুঁজে পেয়েছিল কিনা— সেই আলোচনা বহু শিবিরে ও উপশিবিরে বিভাজিত স্মৃতিভ্রষ্ট বাঙালিদের পক্ষে কীভাবে প্রাসঙ্গিক? অখণ্ড বাংলার ইতিহাস যাদের কাছে আধার ও আধেয় সহ অবান্তর ও মৃত, তারা কি নিছক 'উপন্যাস' পড়ে মজা পাওয়ার জন্যে আবশ্যিক অভিনিবেশ দিয়ে ১০৯৫ পৃষ্ঠা উলটে যাবে? তবু দেবেশ যেহেতু সময়-পথিক, মহাকালের কাছে আপন দায়বদ্ধতার নিদর্শন খোদিত করার জন্যে গদ্যের এই স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। কথাকার যে অধ্যায়-সূচি উত্থাপন করেছেন, তাতেই স্পষ্ট যে এই মহাআখ্যানটি সুচিন্তিত প্রকল্পের ফসল। কথাকার জানিয়েছেন :

> বাংলা বিভক্ত হওয়ায় যোগেন মণ্ডল সম্পর্কে তেমন কোনো দায় বা ভয় জাতীয়তাবাদীদের ছিল না। তাঁকে তাই ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নাম এখন কোনো স্থানীয় ইতিহাসের ফুটনোটেও থাকে না।

মোট কুড়ি খণ্ডে একশো একাশিটি অধ্যায়ে অবিভক্ত বাংলা ও ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে আবর্ত-সংকুল, সবচেয়ে প্রতারণাময়, সবচেয়ে আত্মঘাতী পর্যায়কে উপন্যাসের পদবি দিতে গিয়ে কথাকার খুবই সচেতনভাবে ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়েছেন। ফলে প্রতিটি ঘটনাই তাঁর দ্বারা উত্থাপিত তাৎপর্য-প্রতীতির আলোয় উদ্ভাসিত। যেহেতু তিনি যোগেন মণ্ডলকে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন স্পষ্টতই সুচিন্তিত পক্ষপাতিত্ব নিয়ে, ইতিহাস— অতিকথা—সংযোজন—পুষ্পিত বাচন— সমস্তই তিনি আত্তীকৃত করে নিয়েছেন। তবুও

সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপ্ত এই মহাউপন্যাসে আমাদের ইতিহাসের সমস্ত অন্ধবিন্দুর কিন্তু মীমাংসা হয়নি। দেবেশ যাকে 'বাঙালি ভারতীয়ের নিজেকে খোঁজার আখ্যান' বলেন— সেই খোঁজও যেন অপ্রতিষ্ঠ রয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজের দ্বারা দলিত মথিত নমঃশূদ্র-সহ নিম্নবর্গীয়েরা কেন ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে বর্ণাভিমানী হিন্দুদের চেয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক মুসলমানদের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে এবং ওই ইতিহাসঘাতী দ্বিজাতিতত্ত্বের কুঠারে ছিন্নভিন্ন বঙ্গীয় সমাজের কোনো তরফেই তাদের শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হয় না— মর্মান্তিক এই জিজ্ঞাসার উত্তর কি ২০২০ সালেও আমরা পেয়েছি?

দেবেশের বাচনেই লিখি :

> হয়তো এমন প্রশ্ন কখনওই একক হয় না, সবসময়ই বহুমূল। হয়তো এ প্রশ্নের একটাই উত্তর হয়। হয়তো এ-প্রশ্নের একটা কোনো উত্তর নেই।
>
> (পৃষ্ঠা ২৫)

তাই ১০৯৫ পৃষ্ঠা পড়ে নেওয়ার পরেও বুঝে নিই, বাংলা ভাগ ও বাঙালির বহুধা-বিভাজন ইতিহাসের গোলকধাঁধা হয়েই রয়ে গেছে। এবং তা এভাবেই চিরদিন থেকে যাবে। কেননা হিন্দুস্থান তো বিভাজিত হয়নি; বিভাজিত হয়েছিল আত্মবিস্মৃত বাংলা ও বাঙালি আর প্রখর আত্মসচেতনতা সম্পন্ন পাঞ্জাব। তাই পাঞ্জাবের মানুষ একটু ভিন্নভাবে ইতিহাসের ভ্রান্তি সংশোধন করতে চেয়েছিল; কিন্তু বাঙালি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান নীতির পতাকাবাহীদের কাছে। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দু সমাজ অলীক ভারতবর্ষে নিজেদের নিষ্পেষিত হতে দিয়েছে। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমানেরা সেই হিন্দুস্থানকে মনে-প্রাণে যেমন মেনে নিতে পারেনি, তেমনি নমঃশূদ্র-সহ নিম্নবর্গীয় দলিতজনেরাও নিজেদের দেখতে পেয়েছে ত্রিশঙ্কুর অবস্থানে।

এই নিরিখেই বুঝে নিতে হবে কেন দেবেশ রায়কে *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* নামক মহা-আখ্যান লিখতে হয় যার কার্যত কোনো উপসংহার থাকে না। থাকে না কারণ ইতিহাসের বিভ্রান্তিময় ঘূর্ণাবর্ত ওই উপসংহার থাকতে দেয় না। দেবেশের এই উদ্ভাসনময় মন্তব্যের দিকে অভিনিবেশ দেওয়া প্রয়োজন :

> শিল্প-সাহিত্যে নীরবতা ঘূর্ণির মতো পাকখেয়ে ভিতরের দিকে টান দেয়। অনেক সময় আবার সেই নীরবতাই স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা গল্পে ও উপন্যাসে সেই নীরবতা কি আমাদের লেখকদের মধ্যে তেমন কোনো টান দিয়েছে জলের অতল মাটির দিকে? অথবা আমরা সেই নীরবতাকেও ভুলে গেছি, ভুলে আছি? ...নীরবতা যদি ভাঙতে হয় তাহলে বেঁচে থাকার সেই একটি সমবায়কে টুকরো-টুকরো সব সমাজকে, বিচ্ছিন্ন ধর্মকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। গল্প-উপন্যাসে।
>
> (পৃষ্ঠা ২৮, ৩২)

এই যে প্রশ্নের নির্মাণ শানিত যুক্তিতর্কের পরম্পরা-বাহিত হয়েই তা আখ্যানে উপস্থিত। মীমাংসা হয়তো হল না। তবু এই মীমাংসা-বিহীন জিজ্ঞাসার গ্রন্থনাই দেবেশ রায়ের সবচেয়ে বড়ো অবদান।

এই প্রতিবেদনের সূচনাপর্বে জাক দেরিদার কিছু অবিস্মরণীয় চিন্তাসূত্র স্মরণ করেছিলাম। এই বয়ান যখন সমে ফিরে আসছে, অনুভব করছি দেরিদা-কথিত দর্শন ও নন্দনের নিয়তি দেবেশকে বার বার বর্তমানের বিনির্মাণে প্রণোদিত করেছে। কেননা তাঁরও এই প্রত্যয় যে সৃজনাত্মক লেখায় রয়েছে 'Particularly revelatory symptom' (Positions : 15) সামাজিক সংবিদে নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরিশীলিত কুশীলবেরা নিরন্তর বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়েই জীবন ও জগৎকে বুঝতে শেখে। যতই এগুতে থাকে জীবনের পথে, প্রাগুক্ত সেই উদ্ভাসন ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যত বেশি স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে ওঠে সত্তার অভিযাত্রা, ততই সময় ও পরিসরের দ্বিবাচনিকতা ব্যক্ত হয় শিল্পিত নন্দনের সামর্থ্যে। দেবেশ রায় যত বৃত্তান্ত বা প্রতিবেদন রচনা করেছেন ততই আখ্যানের অতলান্ত সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। জীবন-উপলব্ধির যে দেশজ পরম্পরা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রশ্রয়-লালিত উপন্যাস-প্রকল্পের সর্বগ্রাসী মন্থনে মুছে গিয়েছিল, তাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন দেবেশ। তাঁর দ্বিধাহীন বক্তব্য : 'ঔপন্যাসিক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে যা উপন্যাসে পরিণত করে সেটাই তো ফর্ম।' (১৯৯৪ : ১৭) এই প্রকরণের পুনরাবিষ্কারের বিনির্মাণপন্থাই গ্রহণ করেছেন তিনি। বুঝিয়ে দিয়েছেন, কাহিনিও তো আসলে কাহিনির জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ হল জীবন-সত্যে পৌঁছোনোর সোপান।

প্রাক্‌ঔপনিবেশিক অতীতের সঙ্গে সংযোগ পুনরাবিষ্কার করে তাকে আবার হারিয়ে নতুন করে খুঁজে নিতে হবে। দেবেশের আখ্যানবিশ্ব রচনা আপাতত মোহানায় পৌঁছেছে। এবার সংবেদনশীল পাঠককে গড়ে তুলতে হবে সূত্রধার-কথাকারের সঙ্গে পুনরাবিষ্কার ও পুনর্বিরহের দ্বিবাচনিকতা। ওই কাজ সমবায়ী পাঠক সত্তার; একক কোনো পড়ুয়ার নয়। কেননা 'সব বিবরণের একটা নেপথ্য থাকে। সেই নেপথ্য সমস্ত বিবরণকে ছাপিয়ে যায়, ছাড়িয়ে যায়।' (*একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন* : পৃষ্ঠা ২৫)। অতএব, এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়...